



বীর শহীদ

আশিকুর রহমান হুদয়

জন্ম তারিখ: ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০
শাহাদাতের তারিখ: ৪ এপ্রিল, ২০২৫
বিভাগ: বরিশাল
জেলা: পটুয়াখালী

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা : শ্রমিক

শাহাদাতের স্থান : যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

চোখে স্বপ্ন বুকে গুলি, এটাই কি আমাদের ইতিহাস?

জন্ম ও শৈশব

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সকাল তখন মৃদু কুয়াশায় ঢাকা, দক্ষিণ বঙ্গের নিভৃত গ্রাম জৌতা যেন স্বপ্নের কোনো নীরব ভূমি। সেদিন একটি কুঁড়েঘরে জন্ম নেয় এক শিশু, যার আগমনে দরিদ্র পরিবারটিতে নেমে আসে অদ্ভুত এক আনন্দের আলো। বাবা আনহার হাওলাদার ছিলেন পেশায় রিকশাচালক, ক্রান্ত দুপুরের ঘামে তার সংসার চলত। মা মোর্শেদা বেগম সেই কুঁড়েঘরের কাঁচা মেঝেতে ছেলেকে কোলে নিয়ে দোয়া করেন সন্তান যেন ভালো থাকে, মাথা উঁচু করে বাঁচে। সন্তানের নাম রাখা হয় আশিকুর রহমান হুদয়। যেন ভালোবাসারই আরেক নাম। সেই নামেই যেন ছিল এক কোমল প্রতিশ্রুতি, যেন এক সন্তানবান চিহ্ন।

কিন্তু হুদয়ের জন্মলেখা জীবনের পৃষ্ঠায় বিধিলিপি অন্য কিছু লিখে রেখেছিল হুদয়ের ভাগ্যে ছিল সংগ্রাম, ত্যাগ, আর একদিন শহীদ হওয়ার মহাকাব্য। দরিদ্রতা তাদের চিরসঙ্গী। কাঁচা ঘরের চাল দিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা বারে পড়ত, রান্নাঘরে ধোঁয়া আর অভাবের গন্ধ একাকার হতো। কিন্তু এই অভাবের মধ্যেও ছোট্ট হৃদয় ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, মায়ার পুতুল। স্কুলে যেতে ভালো লাগত তার। পটুয়াখালীর সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই হাতে ক্লাসে বসে থাকা হুদয়ের চোখে ছিল বিশ্বাসের দীপ্তি। তবে সেই শৈশবের সোনালি সকাল খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সংসারের চাপ, অভাবের কশাঘাতে তাকে নামতে হয় বাস্তব জীবনের নির্মম মাটিতে। একদিন ক্লাসের খাতা রেখে হাতে তুলে নিতে হয় ইট, বালতি, শাবল। সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত কোনো রকমে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারলেও অবশেষে পড়ালেখার স্বপ্ন থেমে যায় কাঁচা ঘরের দরজায়। শুরু হয় তার নতুন পরিচয় এক শ্রমিক। মাত্র কিশোর বয়সে শহরের ব্যস্ত নির্মাণস্থলে, কাঠের গুঁড়ি বা ইটের স্তুপে ঘামে ভিজে ওঠা পোশাকে দেখা যায় হুদয়কে। মানুষ তখন তাকে আর শিশুর চোখে দেখত না, সে ছিল একজন খেটে খাওয়া মানুষের প্রতীক। তবু ভেতরে কোথাও সেই স্কুলের ছোট্ট হৃদয়টা বেঁচে ছিল। যে প্রতিবাদ করতে জানত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে জানত, মানুষ হয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখত।

আন্দোলনের মিছিলে

২০২৪ সালের জুলাই মাস বাংলার আকাশ যেন সেদিন ছিল অস্থির। রাজধানী ঢাকায় শুরু হয়েছিল এক বিরল ছাত্র-জনতার জাগরণ। ন্যায় অধিকার, জীবনের নিরাপত্তা আর রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে সারা দেশের তরুণ-তরুণীরা রাজপথে নেমে এসেছিল। এই আন্দোলন ছিল কেবল রাজনৈতিক কোনো ব্যানার নয় এ ছিল বঞ্চিত মানুষের আত্মবাদ, এ ছিল অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার দাবিনামা। আশিকুর রহমান হুদয়, তখন মাত্র চৌদ্দ বছরের এক কিশোর। ঢাকায় দিনমজুরির কাজ করে চলছিল। কিন্তু তার কিশোর বুকে জমে ছিল ক্ষোভ, জমে ছিল দ্রোহ।

যে দেশে তার মতো শিশুরা স্কুলে না গিয়ে ইটের বোঝা টানে, যেখানে তার বাবা-মা চিকিৎসা তো দূরের কথা, দুই বেলা খাবার নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকে সেই দেশে সে মাথা নত করে বাঁচতে চায়নি। ১৮ জুলাই ২০২৪ সেদিন যাত্রাবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি বিশাল মিছিল। শহরের গরম বাতাসে তখনও আশার শীতলতা ছিল, কারণ হাজারো ছাত্র, তরুণ, শ্রমিক কণ্ঠ মিলিয়ে বলছিল "আমরা মানুষ, আমাদের বাঁচার অধিকার চাই।" হুদয় সেদিন কাজ বাদ দিয়ে চলে আসে মিছিলে। হাতে কোনও ব্যানার ছিল না। ছিল কেবল একটাই অস্ত্র, তার সাহস। চোখে ছিল উত্তাল প্রত্যয়, যেন কিশোর শরীরেও বিপ্লব জেগে উঠেছিল। মিছিল ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছিল, আর তার বুকের ভিতর দপদপ করছিল স্বপ্নের আশ্রয়। কিন্তু শান্তিপূর্ণ এই মিছিলে হঠাৎই আকাশ ভেদ করে আসে গুলির শব্দ। পুলিশ ও ছাত্রলীগের বাহিনী এগিয়ে আসে বন্দুক আর লাঠি হাতে। গুলি শুরু হয়।

শহরের কতকিটের ভেতর গরম ছররা ছুটে আসে। কয়েকটি ছররা বুলেট এসে বিদ্ধ করে হুদয়ের কোমল শরীর। আতঙ্কে চারপাশে ছত্রভঙ্গ হয় মানুষ। রক্তাক্ত হুদয় ধপ করে পড়ে যায় রাস্তায়। তার চোখের সামনে তখন সাদা আকাশ, ধূসর ভবিষ্যৎ। কেউ একজন চিৎকার করে ওঠে "একটা ছেলে পড়ে গেছে! ওকে ধরো!" কয়েকজন সহযোগী তাকে তুলে নেয়, রক্তে ভেজা গামছায় তার ক্ষত চোপে ধরে ছুটে চলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দিকে।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

আশিকুর রহমান হুদয় তখন কেবল একজন আহত কিশোর নয় সে ছিল এক প্রতীকের নাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক অবিচল প্রতিরোধ। ঢাকা মেডিকলে নেওয়ার পর তার শরীরে ছররার অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়। চিকিৎসকরা বলেছিলেন, সে সংকটাপন্ন। অর্ধের অভাবে, সরকারি কোনো সাহায্য ছাড়াই শুরু হয় হুদয়ের চিকিৎসার লড়াই। তার বাবা আনহার হাওলাদার নিজের রিকশা বিক্রি করেন। মায়ের শেষ সম্বল গরুটা বিক্রি করা হয় ছেলের বাঁচার জন্য। কিন্তু

সে লড়াই ছিল যেন এক অসম যুদ্ধ। দিন কাটে, সপ্তাহ গড়িয়ে যায়। হৃদয় হাসপাতালের সাদা বিছানায় চুপচাপ তাকিয়ে থাকত সিলিংয়ের দিকে, কখনো ফিসফিস করে বলত, “আমি কি বাঁচব মা?” দীর্ঘ আট মাস মৃত্যুর সাথে লড়াই করে অবশেষে ৪ এপ্রিল ২০২৫, আশিকুর রহমান হৃদয় চলে যায় না-ফেরার দেশে। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সময় তার মা পাশে ছিলেন। মা মোর্শেদার কোলে মাথা রেখে সে চোখ বন্ধ করেছিল। অরাজপথের সেই কিশোর যোদ্ধা পরিণত হয় এক শহীদে। তার নিখর দেহটি গ্রামে ফেরত আনা হয়। দক্ষিণ বাংলার নিঃশব্দ গ্রাম জৌতা তখন কান্নায় নুয়ে পড়ে। যে গ্রাম তাকে জন্ম দিয়েছিল, সেই গ্রামেই একদিন কিশোর হৃদয়ের কবর খোঁড়া হয়। তাকে শায়িত করা হয় পারিবারিক কবরস্থানে নীরব অথচ গর্বিত এক শূন্যতায়। কিন্তু সে চলে যাওয়ার পরও রয়ে গেছে প্রশ্ন এই কিশোরের প্রাণের দায় কে নেবে? রাষ্ট্র? নির্বিকার সমাজ? নাকি আমরা সবাই?

নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদদের মৃত্যু শুধুই একটি পরিসংখ্যান নয়। তা হয়ে ওঠে পরিবারে এক শূন্যতার বিস্তারণ। আশিকুর রহমান হৃদয়-এর মৃত্যুও তেমনি ধাক্কা হয়ে আছড়ে পড়ে তার মা-বাবার জীবনে। গরিব মানুষ তারা, কিন্তু বুকভরা ভালোবাসা ছিল সন্তানটির প্রতি। মা মোর্শেদা বেগম এখনও মাঝেমাঝে বিছানার এক কোণে বসে ছেলের নাম ধরে কাঁদেন। “হৃদয়, তুই তো কইছিলি কাজ করবি, বড় হবি, বাড়িতে টিন দিবি কোথায় গেলি রে বাবা!” এই কথাগুলো প্রতিদিন বাতাসে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু উত্তর আসে না। বাবা আনহার হাওলাদার যেন নিজের শরীরের চেয়ে ছেলের লাশের ওজন বেশি করে টের পান। রিকশা চালাতে গিয়ে মাঝপথে থেমে যান, একটা ছায়ার মতো বেঁচে আছেন শুধু। তিনি বলেন, “ছেলের জন্য আমি সব দিলাম, রিকশা বেচলাম, গরু বেচলাম। কিন্তু কোনো মন্ত্রী, এমপি, নেতা কেউ একদিনও খবর নেয়নি। এমনকি যারা গুলি করল, তারাও তো একটবার ক্ষমা চাইল না।” পরিবারের অন্য সদস্যরাও শোকাহত, কিন্তু সবচেয়ে নিঃশ্ব হয়েছেন এই বৃদ্ধ দম্পতি, যারা শেষ বয়সে সন্তানকে কবর দিতে বাধ্য হয়েছেন। প্রতিবেশীরা বলেন, “ছেলেটা শান্ত ছিল, ভদ্র ছিল, কাজ করত। আন্দোলনে গিয়েছিল বলে সে কি গুলি খাওয়ার যোগ্য?”

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

শহীদ আশিকুর রহমান হৃদয়ের পরিবার আজ শুধুমাত্র শোকসন্তপ্ত নয়, তারা আর্থিকভাবেও মারাত্মক সংকটে নিমজ্জিত। ছোট্ট একটি মাটির ঘরে জীবনযাপন করা পরিবারটির একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন আশিকুর নিজেই। বাবা আনহার হাওলাদার বয়সের ভারে নুয়ে পড়া একজন রিকশাচালক দিনে চলে তো রাতে চলে না। মা মোর্শেদা বেগম কোনো আয় করতে পারেন না। হৃদয়ের শহীদ হওয়ার পর পরিবারটি নিঃশ্ব হয়ে পড়ে। চিকিৎসার খরচ চালাতে গিয়ে বিক্রি হয়ে যায় শেষ সম্বল। রিকশা ও একটি গরু। চিকিৎসার দিনগুলোতে কোনো এনজিও, সরকারি প্রতিনিধি কিংবা সমাজসেবামূলক সংস্থা পাশে এসে দাঁড়ায়নি। একা একাই যুদ্ধ চালিয়েছে এই পরিবার।

বর্তমানে পরিবারটির জীবনযাত্রা দুর্বিষহ। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা চরম পর্যায়ে। মাথার উপর টিনের ছাউনি থাকলেও, আয়ের উৎস নেই। প্রয়োজন নতুন উপার্জনের পথ, যেমন: একটি ছোট মুদি দোকান বা কৃষিকাজের জন্য সহযোগিতা। এই পরিবারটি কেবল সহানুভূতি নয়, বাস্তব সহায়তা চায়। কারণ রাষ্ট্র যখন একজন কিশোরকে শহীদ হতে বাধ্য করে, তখন তার পরিবারের দেখভালের নৈতিক দায়িত্বও সেই রাষ্ট্রের।

শেষ কথা

আশিকুর রহমান হৃদয় একটি নাম, একটি কিশোর, একটি জীবন; কিন্তু তার জীবনের গল্পটি কেবল একটি শহীদদের জীবনগাথা নয়। এটি আমাদের সময়ের এক নির্মম সত্য, এক অদৃশ্য রক্তেরনা যা টেনে দিয়েছে সমাজের বৃকে, রাষ্ট্রের শিরায়। হৃদয় সেই কিশোর, যে জন্ম নিয়েছিল স্বপ্ন নিয়ে; যে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল মাথা উঁচু করে, শ্রমের ঘামে দিন গড়ে; কিন্তু যে থেমে গেলো বন্দুকের মুখে, হররা বুলেটের আঘাতে। তার মৃত্যু ছিল না শুধু এক ব্যক্তিগত ক্ষতি তা ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার এক ন্যাকারজনক ব্যর্থতা।

একটি শিশুর কলম ফেলে ইট ধরার গল্প যখন রক্তে রঞ্জিত হয়, তখন তা সমাজের প্রতি এক কলঙ্কচিহ্ন হয়ে ওঠে। হৃদয়ের জীবন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমরা কেমন সমাজে বাস করি। যেখানে শিশুদের স্বপ্ন থাকে, কিন্তু তা গুলি করে ধামিয়ে দেওয়া হয়। যেখানে মা-বাবা জীবনের শেষ সম্বল বিক্রি করেও সন্তানকে বাঁচাতে পারেন না। যেখানে শহীদদের নামে শোক প্রকাশ হয়, কিন্তু পরিবার পড়ে থাকে অবহেলায়। তার রক্তধারায় লেখা হয়েছে এই সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ অধ্যায় এক ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-জনতার সংগ্রামের ইতিহাস।

এই রক্ত শুধু মাটি রঞ্জিত করেনি এটি সময়কে ধুয়ে দিয়েছে, বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা হৃদয়ের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি, শান্তির জন্য দোয়া করি।

কিন্তু সেই প্রার্থনার পাশাপাশি আমাদের কর্তব্য তার পরিবারের মুখে আবার যেন হাসি ফোটে, তারা যেন আবার বাঁচার সুযোগ পায়। হৃদয় আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু তার ছেড়ে যাওয়া যেন নিরর্থক না হয়। তার তাগ হোক আমাদের জাগরণ, তার মৃত্যুই হোক আমাদের আগামী দিনের নতুন সূর্যোদয়।

শহীদদের পূর্ণ নাম : আশিকুর রহমান হৃদয়

জন্ম তারিখ : ০৮/০২/২০১০

জন্মস্থান : গ্রাম-জৌতা, পোস্ট অফিস- নগরের হাট, ওয়ার্ড- ০৮নং, উপজেলা- বাউফল, জেলা- পটুয়াখালী

পেশা : শ্রমিক

স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: জৌতা, ইউনিয়ন: বাউফল , থানা:বাউফল, জেলা:পটুয়াখালী

পিতার নাম : আনছার হাওলাদার

মায়ের নাম : মোর্শেদা বেগম

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৭ম

পরিবারের সদস্য : ০২জন (বাবা,মা) ভাইয়েরা ভিন্নভাবে থাকে

ঘটনার স্থান : যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

আক্রমণকারী : পুলিশ, ছাত্রলীগ

আক্রমণের ধরণ : ছররা বুলেট।

আহত হওয়ার তারিখ : ১৮ জুলাই ২০২৪

শহীদ হওয়ার তারিখ : ০৪ এপ্রিল ২০২৫

শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান : পারিবারিক কবরস্থান

প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১ : ছোট মুদি, মনোহারি দোকান করে দেওয়া

প্রস্তাবনা-২ : মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা একনজরে শহীদের প্রোফাইল

পবিত্র কুরআনের বাণী

তারা তাদের রবের দেওয়া অনুগ্রহে আনন্দিত, এবং যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি তাদের জন্যও তারা সুসংবাদ গ্রহণ করে। (সূরা আলে ইমরান ৩:১৭০)

হাদীস শরীফ

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছে দেন।” (সহীহ মুসলিম ১৮৮৮)

দোয়া পাঠ: 1 জন

শহীদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি

